পথের দাবি

সাজ্জাদ জহির

ব্রিটিশদের মাধ্যমে ইসলামী শাসন, তথা স্বাধীনতার সূর্য অস্ত যাবার পর থেকে আজ অবধি বাংলাদেশের মানুষ নিপীড়িত ও পরাধীনতার আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে চলছে। কখনো ইনসাফের নামে, কখনো স্বাধীনতা ও সুবিচারের নামে, কখনো গণতন্ত্রের নামে, কখনো বৈষম্য অবসান বা সংস্কারের নামে- বারবার আপামর জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে, হচ্ছে। নতুন নতুন বোতলে সেক্যুলারিজম ও নিপীড়ক রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে জালিমের দল শোষণ করেই চলেছে। সময়ের সাথে সাথে শাসকগোষ্ঠীর চামড়ার রং, মুখের ভাষা বা অঙ্গভঙ্গির পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটলেও অত্যাচার ও বিভ্রান্তির বাত্যয় ঘটেনি।

ইসলাম ১২০০ বছর ধরে দুনিয়ার পূর্ব থেকে পশ্চিমের মানুষের অন্তর ও জীবনের সজীবতার কারণ হয়েছে। ইসলামই ছিল ধনী-গরীব, মুসলিম-অমুসলিম, শ্রমিক কৃষক, নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবার নিরাপত্তা, ইনসাফ ও কল্যাণের দিকনির্দেশক। বাংলাদেশও আলহামদুলিল্লাহ এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত ছিল না। বহু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইসলামী শাসনাধীন বাংলার যে গৌরব ও মর্যাদার অতীত ছিল, তা ব্রিটিশ, পাকিস্তানি ও বাংলাদেশী সেক্যুলার রাষ্ট্রযন্ত্রের নিষ্পেষণে আজ রূপকথার কল্পলোকের মত বোধ হয়।

পুরো পৃথিবী জুড়েই লিবারেল বেনিয়াদের সামরিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের দরুন আধুনিক সময়ে খ্রিস্টান-ইহুদি-হিন্দুসহ প্রায় সকল জাতি নিজ ঐতিহ্য, মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে আধুনিক অভিশাপ লিবারেলিজমে দীক্ষিত হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র ইসলামের পতাকাবাহীরাই এই সাম্রাজ্যবাদী, নাস্তিক্যবাদী ও খোদাদ্রোহী লিবারেলদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে মানবজাতির সর্বশেষ রক্ষক হিসেবে নিজেদের প্রমাণে সক্ষম হয়।

তাই তো বিশ্বব্যাপী এবং আমাদের দেশেও সবচেয়ে উৎপীড়িত, মজলুম হচ্ছে আদর্শের শক্তিতে অগ্রসরমান ইসলামপন্থীরা। কেননা তারা তুচ্ছ স্বার্থে, ক্ষমতা ও অর্থের মোহে লিবারেল গণতান্ত্রিকদের মাঝে একেবারে বিলীন হয়ে যাননি। আল্লাহ তা'আলার পর, প্রত্যেক লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও হতভাগ্য মানুষের আশ্রয়স্থল এই হকের ঝান্ডাবাহী ইসলামপন্থীরাই। নগ্নতা, অশ্লীলতা, জুলুমসহ সকল নৈতিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক শোষণের মূল উপড়ে ফেলতে আপামর জনসাধারণ তাই সত্যভাষী, আত্মত্যাগী ইসলামপন্থীদের দিকেই তাকিয়ে থাকে।

এলক্ষ্যেই ইসলামপন্থীরা বিদ্যমান অসুস্থ সমাজের আমূল পুনর্গঠন আর রাজনৈতিক জুলুম পুরোপুরি বিলুপ্ত করতে আগ্রহী। নিজেকে মুক্ত করার ভেতর দিয়ে ইসলামপন্থীরা আপামর জনসাধারণকে সমস্ত রকমের শোষণ থেকে মুক্ত করে। শুধু মুসলিমরা নয়, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকল জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (self determination) ফিরিয়ে দেওয়ার মত ভারসাম্যপূর্ণ নেতৃত্বের গুণ কেবল মুসলিমদেরই ছিল, আছে। কেবল বাঙালি নয়; চাকমা-মারমা-হাজং-মুরংসহ সকল নৃগোষ্ঠীর (ethnicity) স্বাধীন ও নিরাপদ জীবনের পথে নিকৃষ্ট বাধা অন্ধ-জাতীয়তাবাদের (chauvinism) বিলোপ করতে সক্ষম একমাত্র ইসলামপন্থীরা। সাহাবায়ে কেরামদের উত্তরসূরী ইসলামপন্থীরাই তাই বিশুদ্ধ জ্ঞান (ইলমে ওহী) ও নববী হিদায়াতের আলোকে এদেশকে সকল প্রকার বৈষম্য মুক্ত করতে সক্ষম।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, জাহিলি মতাদর্শের শেকড় উপড়ে ফেলার পরিবর্তে অজ্ঞতা বা অনুমানবশত অতিসরলতার বশবর্তী হয়ে ইসলামপন্থীদের একটি অংশ সেক্যুলার গণতান্ত্রিক কাঠামোর বেঁধে দেয়া নিয়মে রাজনীতি করতে গিয়ে অবচেতনভাবেই ইসলামের বিপ্লবী চেতনাকে দুর্বল ও পঙ্গু করে ফেলতে চেয়েছে। ইলমি ময়দানের সাথে সম্পৃক্ত এসকল ইসলামপন্থীদের এই ঘোরের কিছু আকিদাগত, কিছু ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। আশা করি এসকল ব্যক্তিরা নিজেদের ভুল একদিন বুঝতে পারবেন ইন শা আল্লাহ।

অন্যদিকে ইসলামকে স্রেফ অর্থ, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার রাজনীতির হাতিয়ার বানিয়ে নিয়েছে সংসদীয় রাজনীতির অনুসারী প্রতিক্রিয়াশীল 'ইসলামপন্থী' দাবিদাররা। যাদের নেতৃত্ব যতটা না আসলে 'ইসলামপন্থী', তার চেয়ে বেশি সেক্যুলার।

আবার যান্ত্রিক ও সংকীর্ণভাবে 'জিহাদী' চিন্তাধারাকে প্রয়োগ করে প্রকৃত ইসলামপন্থার চেতনাকে (Spirit) জনবিচ্ছিন্ন স্রোতে প্রবাহিত করছে আরেকটি শ্রেণী। রাজনৈতিক অপরিপক্কতা ও সঠিক মানহাজের সমন্বয় ঘটাতে ব্যর্থতা—তাদেরকে নিজস্ব গণ্ডিতে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ করে ফেলেছে। বিচ্ছিন্ন, লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন সহিংসতার মাধ্যমে ইসলাম ফিরিয়ে আনার অসম্ভাব্যতার বিষয়টি তাই তাদের কাছে বেশ অস্পষ্ট। জনমানুষের কাছে যাবার পূর্বে অন্ধ আন্তর্জাতিকতাবাদ চর্চাও তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম অনুঘটক। আল্লাহ তা আলাই ভালো জানেন। আশা করি একদিন হয়তো আল্লাহ তা আলা তাদের উত্তম অংশকে পরিপূর্ণ বুঝ দান করবেন।

এতদসত্ত্বেও, আমাদের দেশে প্রকৃত ইসলামপন্থীদের দীর্ঘ দিনের বুদ্ধিবৃত্তিক ও দাওয়াতী কাজের ফলে সমাজে বিশুদ্ধ চিন্তা-মানহাজের বিকাশ কিছুটা হলেও ঘটেছে।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ইসলামপন্থীদের আদর্শিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপকে বিকশিত ও পূর্ণতা দানে প্রয়োজন কেন্দ্রীকৃত সুশৃঙ্খল তানজিম বা সংগঠন। যে তানজিম মুসলিমদের সংগঠনের লক্ষ্যের ঐক্য আর সংগ্রামের উপায়ের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প। পাশাপাশি, এই সংগঠন এমনভাবে কর্মসূচি গ্রহণের পন্থা অবলম্বন করে, যেন তা ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম হয়ে ওঠে। যে সংগঠন হয়ে ওঠে সাহাবায়ে কেরামের বীরত্বময় ঐতিহ্যের বাহক।

এই সংগঠন বিশ্বাস করে পৃথিবীর বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য এবং নৈতিক, মানসিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মানুষের মুক্তির পরাক্রান্ত বাহন হলো ইসলাম। ইসলাম ব্যক্তির আত্মিক, পার্থিব ও পরকালীন মুক্তির জন্যই সামগ্রিক বিপ্লবকে অনিবার্য করে তোলে।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহবান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০৪)

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَ لَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত,যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। তাদের অধিকাংশই ফাসিক।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১১০)

তাই ইসলামই একমাত্র বৈপ্লবিক কার্যক্রমের পথপ্রদর্শক হতে পারে। সেক্যুলার আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইসলামপন্থীরাই জনগণের প্রকৃত বন্ধু। এই লড়াইয়ে মানুষের নেতা হতে পারে তাই কেবল ইসলামপন্থীরাই।

আর যখন সঠিক ইসলামী আকীদা ও মানহাজের আলোকে ইসলামপন্থীদের অগ্রগামী সংগঠন মুসলিমদের ইতস্তত ও বিক্ষিপ্ত মেহনতকে সচেতন সংগ্রামে পরিণত করতে সক্ষম হবে, তখন এক পর্যায়ে বিইযনিল্লাহ পুরো জনগোষ্ঠীর সামনে থেকে ইসলামপন্থী নেতৃত্ব বিদ্যমান জালিম শাসনব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে- প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে বিজয়ী হবে ইসলামী বিপ্লব।

ইতিহাস বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আন্দোলন সংগঠিত আর পরিচালিত করার যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ তুলে না ধরে কোন শ্রেণী কখনই শাসনকর্তৃত্ব অর্জন করেনি। আর এক্ষেত্রে ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক নেতা হলো প্রকৃত ইসলামী বৈপ্লবিক সংগঠন।

গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে, সংগঠন ইসলামপন্থীদের একটি অংশ। তাদের অগ্রগামী বাহিনী। সমস্ত ইসলামপন্থীগণ ও জনসাধারণ এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। মুসলিমরা বিভিন্ন উপাদানে গঠিত, তাদের বিভিন্ন অংশের ঈমানি, নৈতিক আর রাজনৈতিক চেতনার মান বিভিন্ন। সেক্যুলার শাসনব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক জমিদাররা যেসব মানুষের সর্বনাশ করে, তারাও সবসময়ই

ইসলামপন্থীদের মাঝে থাকে। এজন্যই, অগ্রগামী ইসলামপন্থী আর সাধারণ ইসলামপন্থীদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

ইসলামপন্থীদের সেরা সেরা প্রতিনিধি তথা যারা ঈমানী চেতনায় দীক্ষিত, সুন্নাহর অনুসারী, রাজনৈতিকভাবে সচেতন, সংগঠিত আর সাহসী এবং বিপ্লবী আদর্শের প্রতি অনুগত- তাদেরকে সদস্যভুক্ত করার মাধ্যমে সংগঠন বিকশিত হয়।

ইসলামপন্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে সুসংগঠিতভাবে অগ্রসর করা, ইসলামপন্থীদের সঠিক পথ দেখানো, সংগ্রামের মধ্যে ইসলামপন্থীরা যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হয় তার উত্তর দেয়া, ইসলামপন্থীদের সংগঠিত করা এবং অনগ্রসর অংশকে অগ্রগামীদের স্তরে উন্নীত করা- সংগঠনের নির্দিষ্ট করা কাজের অন্যতম।

ইসলাম ও কুফরের চিরন্তন দ্বন্দ্বের হাকিকত এবং তার আলোকে সমাজ রূপান্তরের নিয়মাবলী জানে বলেই সংগঠন ইসলামপন্থীদের আন্দোলন পরিচালনা করতে পারে। সংগঠনকে জানতে হয়, ইসলামের জন্য বিরামহীন সংগ্রামে লিপ্ত ইসলামপন্থীদের দায়িত্ব হচ্ছে সমস্ত রকমের আদর্শিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক আর জাতিগত উৎপীড়ন থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করা। ইসলামী মনোভাবাসম্পন্ন সংগঠকেরা তাই নিজেদের চারপাশে সমস্ত সংগ্রামী মানুষের সমাবেশ ঘটায়। ইসলামপন্থীরা তাই জানে শাসক-শোষকরা কেন তাদের ভয় পায়। এই সেক্যুলার শাসকগোষ্ঠী সমাজকে কেবল বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই নয়, বরং স্কুল-কলেজ, মিডিয়া হাউজ, সংবাদপত্র, সাহিত্য ও শিল্প দ্বারাও নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। ইসলামপন্থীদের দুর্বল করতে, বিভক্ত করতে এবং ভ্রান্ত পথে চালিত করতে লিবারেলরা/সেক্যুলাররা চেষ্টা করে সর্বাত্মক উপায়ে। এই দুষ্কর্মে তাদের মদদদাতা আর সাফাইদার হল ইসলামপন্থীদের মধ্যকার সুবিধাবাদীরা। যারা এমনসব ধ্যানধারণা ছড়ায় যে, বিপ্লব ছাড়াই সংস্কারের মাধ্যমে ইসলাম আসতে পারে। তাই বৈপ্লবিক চিন্তার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শামিল হওয়াই কাম্য। জাতীয়তাবাদী চেতনার মাধ্যমে, নৃতাত্ত্বিক বিভাজনের মাধ্যমে সেক্যুলাররা ইসলামপন্থীদের কাতারে বিভক্তি আনতে চায়। এজন্যই কুফরী আকিদা ও কুফরের পতাকাবাহী সেক্যুলারদের কর্মনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইসলামপন্থীদের জন্য চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয় ইসলামপন্থীদের অগ্রগামী সংগঠন। এই সংগঠন সতর্কতার সাথে ইসলামী আন্দোলনের স্বাতন্ত্র্য নিরাপদ রাখে এবং ইসলামপন্থীদের মাঝে সহীহ আকিদা, নববী মানহাজের আলোকে বিশুদ্ধ ইসলামি চেতনার প্রসার ঘটায় অক্লান্তভাবে।

ইসলামী বিপ্লব একটি গভীরপ্রসারী ওলটপালট। তাতে উৎপীড়ন আর বাতিল জগতের বিরুদ্ধে আখেরি লড়াইয়ে সমস্ত সত্যানুসন্ধানী ও নিপীড়িত মানুষকে পরিচালিত করে ইসলামপন্থীরা। বৈপ্লবিক মানসিকতা বিকাশে ইসলামপন্থীদের তরবিয়ত(দীক্ষা) দেয়া সংগঠনের সর্বপ্রধান কাজের অন্যতম। সংগঠনের জন্য কেবল নিজেকে জনগণের অগ্রগামী অংশ বলাই যথেষ্ট নয়। কাজের ভেতর দিয়ে তার সার্বজনীন স্বীকৃতি পাওয়া চাই। সমাজের যে কোনো শ্রেণী বা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হোক, বিভ্রান্তির শিকার হোক, স্বেচ্ছাচারী শাসন আর উৎপীড়নের ভুক্তভোগী হোক—সমস্ত ক্ষেত্রে ইসলামপন্থীদের সাড়া দিতে শেখানো সংগঠনের কর্তব্য। যে ইসলামী বিপ্লবী যে কোনো সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে ইসলামী মতাদর্শ আর অধিকারের কথা উচ্চারণ করে এবং ইসলামী মুক্তিসংগ্রামের যুগান্তকারী তাৎপর্যের ব্যাখ্যা দেয়, সে হয়ে ওঠে জনগণের মুখপাত্র।

ঠিক একারণেই বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এবং মুমিনদের সংগঠনই তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এ বিষয়টি স্রেফ তাত্ত্বিকতা নয়, বরং ইসলামপন্থীদেরকে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই বুঝতে, শিখতে হয় যে—সংগঠনই তাদের শক্তি, ঐক্যবদ্ধ ইসলামপন্থীরাই সব কিছু এবং বিভেদগ্রস্থ হলে তারা কিছুই না। যুগে যুগে বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে বিপ্লবীদের এমন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা তাই সুস্পষ্টভাবেই দেখা যায়।

ইসলামের জন্য সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে সেক্যুলার রাষ্ট্র বারবারই আক্রমণ চালিয়েছে। তাদের হাতে ছিল দমন-নিপীড়নের সকল হাতিয়ার আর মানসিক দাসত্ব চাপিয়ে দেবার বহু উপকরণ ও কৌশল। আর এজন্যই সেক্যুলার রাষ্ট্র নামক নিপীড়ক সংগঠিত শক্তির মোকাবিলায় বিপ্লবী, কেন্দ্রীভূত সংগঠন এবং তার নেতৃত্বে ইসলামপন্থীদের সংগঠিত হওয়ার বিকল্প নেই।

এক্ষেত্রে অবশ্যই সংগঠনের মূল অংশকে তথা সদস্যবৃন্দের সকলকে প্রকৃত বিপ্লবী চেতনার হতে হবে। তারা হবে ইসলামী আকীদা মানহাজে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং বিস্তৃত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন একনিষ্ঠ মানুষ। তারা আত্মনিয়োগ করবে বিপ্লবের জন্য, ইসলামপন্থীদের প্রতি তাদের আনুগত্য চূড়ান্ত। সকল প্রকার প্রতিকূল পরিবেশে সংগ্রাম ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনে তাদের অবশ্যই সক্ষম হতে হবে।

তবে, প্রকৃত বিপ্লবীদের সাথে জনবিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর কোন মিল নেই। একজন বিপ্লবী সবসময় থাকে জনগণের একেবারে মাঝখানে।

একজন বিপ্লবী তাদের চাহিদা জানে, তাদের ভাবনা-অনুভূতিতে সাড়া দেয় এবং নির্যাতিত, প্রবঞ্চিত জনগণের রাজনৈতিক চেতনা আর বৈপ্লবিক উদ্যম বাড়াবার জন্য সংগঠিতভাবে কাজের মান উন্নত করার লক্ষ্যে সাধ্যানুযায়ী সবই করে থাকে।

??? ???????: ????????? ? ????

বিপ্লবের পথে মানুষ ও সমাজকে নতুন করে গড়তে ক্রিয়াশীল সংগঠনের প্রধান নীতি হওয়া চাই— ইসলামী শরীয়াহর আলোকে প্রবল আনুগত্যের নীতি। পৃথক পৃথক গ্রুপের ইতস্তত ও বিক্ষিপ্ত কাজকারবার দিয়ে কখনোই বিজয় অর্জন সম্ভব নয়। কেন্দ্রীকৃত নেতৃত্বের আনুগত্যের মাধ্যমেই সমস্ত শক্তিকে একজোট করে ইসলামপন্থীদের বিপ্লবী সংগঠন সবাইকে একই লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং পৃথক পৃথক ব্যক্তি ও দলকে সম্মিলিত একক লক্ষে ধাবিত করতে পারে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ: ইবনে উমর রা: থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূল সা: থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সা: বলেন:

> “মুসলিম ব্যক্তির উপর, সে যা পছন্দ করে ও যা অপছন্দ করে উভয় বিষয়ে শোনা ও মানা আবশ্যক, যতক্ষণ না তাকে গুনাহের আদেশ করা হয়। যখন গুনাহের আদেশ করা হবে তখন আর শোনা ও মানা আবশ্যক নয়।”

রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, সহীহ বুখারীর মধ্যে এসেছে, আলি ইবনে আবি তালিব রা: থেকে বর্ণিত:

> “নিশ্চয়ই আনুগত্য হয় কেবল ন্যায়সঙ্গত কাজে।”

আমিরের আনুগত্যের প্রকৃত রূপ প্রকাশ পাবে সে সময়, যখন একজন ব্যক্তি একটি বিষয় অপছন্দ করে, সে একটি বিষয়কে ভালবাসে না, তা তার নিকট অপছন্দনীয়। এজন্যই আনুগত্য পছন্দে ও অপছন্দে।

যেমন সহীহ মুসলিমে এসেছে, আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত, রাসূল সা: বলেন:

> “তোমার উপর আনুগত্য করা আবশ্যক তোমার বিপদে ও সুখে, পছন্দে ও অপছন্দে এবং তোমার উপর কাউকে প্রাধান্য দেওয়া সত্ত্বেও।”

ইমাম নববী রহ: শরহে সহীহ মুসলিমে বলেন:

> “হাদীসের অর্থের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম বলেন, এর অর্থ হল, দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করা ওয়াজিব যে বিষয় কঠিন মনে হয় এবং যেটাকে অন্তর অপছন্দ করে বা এধরণের বিষয়ে, যেটা গোনাহের অন্তর্ভূক্ত নয়। যদি গোনাহের আদেশ হয় তাহলে তা শোনা বা মানা আবশ্যক নয়।”

মানুষ নিজেদের ঈমানী ও রাজনৈতিক প্রত্যয়কে ভিত্তি করেই স্বেচ্ছায়, সন্তুষ্টচিত্তে বৈপ্লবিক সংগঠনে যোগ দেয়। কাজেই তাদের সংগঠন, আর কার্যাবলীর ঐক্য গড়া সম্ভব কেবল নববী হেদায়েতের আলোকেই। অর্থাৎ, সংগঠনের কর্মনীতি, পরিকল্পনা আর লক্ষ্য নিয়ে সমষ্টিগত আলোচনা তথা মাশওয়ারার ভিত্তিতে।

আল্লাহ তা’আলা বলেন:

> وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
>
> (মু’মিনগণ) যারা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে। [সূরা শূরা ৪২:৩৮]

পরামর্শের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন—

> وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ
>
> (নবীকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা’আলা আদেশ করেছেন যে,) কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। [সূরা আল -ইমরান ৩:১৫৯]

এই দুই মূলনীত—মাশওয়ারা ও ইতাআত ব্যতীত সংগঠন স্রেফ কিছু লোকের সমষ্টি বা গোত্রে পরিণত হয়। এ ব্যতীত শৃঙ্খলা

ভেঙ্গে পড়ে এবং সংগঠন স্থবির ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

শৃঙ্খলা ব্যতীত, সমষ্টিগতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত- সমস্ত সদস্যের অবশ্যপালনীয় হওয়া ব্যতীত ঐক্যবদ্ধ ও কেন্দ্রীকৃত সংগঠনের কথা কল্পনাই করা যায় না। কেবল আকিদা-মানহাজের ঐক্য নয়, সাংগঠনিক ঐক্য বলতে বোঝায় নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা-সংক্রান্ত নীতিসমূহের ঐক্য। সেটা হওয়া চাই সংগঠনের প্রত্যেকটি সদস্যের জন্য আবশ্যক—তিনি যে পদেই থাকুন না কেন। তবে, সংগঠন যেন শৃঙ্খলা-সচেতন, ইতাআতের নীতিকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে- মুকাল্লিদ, অন্ধ, সংকীর্ণ, সাম্প্রদায়িক বা যান্ত্রিক না হয়ে ওঠে।

প্রত্যেক সদস্যই এই মূলনীতির আলোকে সহিহ মানহাজ ও সঠিক রাজনৈতিক লাইনের বিচ্যুতি দেখামাত্র নেতৃত্বকে প্রশ্ন করতে, আপত্তি উত্থাপন করতে পারবেন এবং সঠিক পরামর্শ-সংশোধনী দিবেন। যে কোনো প্রকার নসীহার সুযোগ মাশওয়ারার নীতির আলোকে সমস্ত সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংগঠনের সকল সদস্যই সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم
>
> "দ্বীন হল-কল্যাণকামিতা। (সাহাবায়ে কেরামের উক্তি) আমরা বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! দ্বীন কার জন্য কল্যাণকামিতা? তিনি বললেন-আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল ও মুসলিম উম্মাহর আমির-উমারা এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য"।

(হাদিসটি সহীহ মুসলিমে হযরত তামিম দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত)

বাকি, যখন সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে কিংবা বৈধ কেন্দ্রীয় নির্দেশনা আসবে- তখন সমস্ত সদস্য ঐক্যবদ্ধভাবে (শারঈ মূলনীতি ও বাস্তবতাকে সামনে রেখে) ইতাআতের মূলনীতির আলোকে তা বাস্তবায়ন করা চাই।

এভাবেই মাশওয়ারা/শুরা ও ইতাআতের নীতির আলোকে সংগঠনের শক্ত কেন্দ্র গড়ে ওঠার পাশাপাশি সদস্যদের কাছে জবাবদিহিতামূলক নেতৃত্ব নিশ্চিত হয়। এছাড়াও, সদস্যদের উদ্যম, সৃজনশীলতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে সংগঠন ক্রমাগত গতিশীল ও বিকশিত হয়। ফলশ্রুতিতে, সংগঠন ইসলামপন্থীদের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সংগঠক, নেতৃত্ব ও পরিচালক রূপে আবির্ভূত হয়।

[২]

সংগঠনের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠা ইসলামপন্থীদের ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায়। অথচ, একটি তানজিম কোনো দেশের জনসমুদ্রের ক্ষুদ্র অংশমাত্র। বিপ্লবীরা জাতির বাইরে বা ঊর্ধ্বে কিছু না, বরং তারা এ দেশের মানুষের, মুসলিমদের অংশমাত্র। দেশের বাস্তবতা, মানুষের প্রয়োজন এবং রাজনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনাকে বিবেচনায় নেয়ার ক্ষেত্রে তো বটেই, ইসলামী মূলনীতির আলোকেও এমনটা মারাত্মক ক্ষতিকর। এ বিষয়টি অন্তরে গেঁথে নেয়া ও আচরণে-কথা-কাজে পরিণত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিপ্লব কখনোই সংগঠন এককভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। ইসলামপন্থীদের পাশাপাশি সাধারণ জনগণ ও ইসলাম-আকাঙ্ক্ষী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সমর্থন, অংশগ্রহণ অবশ্যই প্রয়োজন। কাজেই, সংগঠন ছাত্র-শ্রমিক-পেশাজীবী নির্বিশেষে ইসলামপন্থী ও সাধারণ মানুষের নিকট নিজ লক্ষ্য ও কর্মসূচির যথার্থতাকে উপলব্ধি করানোকে প্রধান কাজ হিসেবে গণ্য করে। এবং সাংগঠনিক লক্ষ্য ও দাবীর সাথে তাদের সমর্থন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চেষ্টা করে।

কোনো সন্দেহ নেই যে, সেক্যুলার গোষ্ঠীর পাশাপাশি 'ইসলামপন্থী' নামধারী প্রতিবিপ্লবী শক্তিও বিপ্লবীদের কোণঠাসা করতে, জনগণ থেকে দূরে রাখতে কোন অপচেষ্টাই বাদ রাখবে না। একজন বিপ্লবীর জীবন তাই কঠিন হয়েই ওঠে। বালা-মুসিবত তাদের ঘিরে রাখে। বন্দীত্ব, নির্বাসনসহ যাবতীয় নিপীড়ন আবু জাহেল, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রেতাত্মাদের পক্ষ থেকে বিপ্লবীদের উপর নেমে আসাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু, আবু বকর, বিলাল, হামজা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)দের উত্তরসূরী প্রকৃত বিপ্লবীরা কষ্ট, অভাব-অনটনের কাছে দমে যায় না। তারা যেখানেই যায়, নিজ দ্বীন ও আখলাকের সৌন্দর্য্যের কারণে জনগণের দরজা নিজেদের জন্য উন্মুক্তই পায়। অনাড়ম্বর, দৈনন্দিন, কষ্টসহিষ্ণু বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের ছেদ ঘটানো তাই সেক্যুলারদের জন্য সহজ নয়।

একইসাথে, যে সদস্যের যেদিকে ঝোঁক তাদেরকে সেদিকে নিয়োজিত করাই কাঙ্খিত। হয়তো কেউ হবেন আলেম, তালেবে ইলম, দ্বাঈ, এক্টিভিস্ট বা বুদ্ধিজীবী। অর্থাৎ, সরলভাবে বললে- গবেষক, প্রচারক বা আলোচক। আর কেউ হবেন সংগঠক।

সর্বোপরি নিজেদের শক্তির উপর আস্থা এবং ইসলামই যে শুধু উদ্ধার করবে এই উপলব্ধি; কেবল এই দুটো জিনিসেরই কমতি রয়েছে জনমনে। এই আস্থা আর উপলব্ধি কেবল তাদের দিতে পারে ইসলামপন্থীদের অগ্রগামী সদস্যদের গড়া বিপ্লবী সংগঠন।

পরিশেষে পুরো আলোচনার সার হিসেবে গুরুত্ব বিবেচনায় বলতে হয়—

মিথ্যা ও কুফরের পতাকাবাহী বাতিলপন্থী সেক্যুলারদের বিরুদ্ধে ইসলামপন্থীদের অগ্রগামী সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত বিপ্লবী সংগঠন আল্লাহ তা আলার ইচ্ছায় দুনিয়াতে জনসাধারণের শেষ আশ্রয়স্থল। যে সংগঠন গঠিত হওয়া চাই দৃঢ়চেতা, সাহসী, অভিজ্ঞ বিপ্লবীদের সমন্বয়ে। উলামায়ে কেরাম-ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-পেশাজীবি-বুদ্ধিজীবীসহ আপামর জনসাধারণের সবচেয়ে অগ্রগামী প্রতিনিধিদের জড়ো হতে হবে বিপ্লবীদের চারপাশে। এই সংগঠনকে হতে হবে জনগণের আস্থাভাজন, জনগণের সমর্থনপুষ্ট।

সত্যপিপাসু, নিপীড়িত জনতা নৈতিক, রাজনৈতিক মুক্তির জন্য, দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির জন্য এবং কর্তৃত্বলাভের পর ইসলামী সমাজ পরিচালনার জন্য বৈপ্লবিক সংগঠনে অবশ্যই থাকা চাই শৃঙ্খলা এবং সদস্যশ্রেণীতে মত ও কর্মের ঐক্য। কেননা, সংগঠনের সদস্যশ্রেণী আর নেতৃত্বের ভেতর ঐকমত্য না থাকলে কোনো সংগঠনই সমন্বিত কাজ চালাতে পারে না। সংগঠনের সিদ্ধান্তসমূহ রচিত ও গৃহীত হওয়া চাই মাশওয়ারার নীতি মোতাবেক। সংগঠন উশৃঙ্খলতা বরদাশত করতে পারে না। সংগঠনের সমস্ত শাখা অবশ্যই সাংগঠনিক নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত আর নির্দেশ পালন করবে। এটা না হলে বৈপ্লবিক সংগঠন দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের মুক্তি আন্দোলন কিংবা নতুন জীবন গড়ার কাজে নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকতে পারে না। নেতৃত্বের গৃহীত এক ও অভিন্ন পরিকল্পনা অনুসারে সংগঠনের সকল স্তর ও সদস্যের কাজ পরিচালিত হওয়া চাই। তবেই সংগঠনের কার্যকলাপ হয় সুসংগঠিত ও সাফল্যমন্ডিত।

যুগে যুগে ইসলামের পতাকাবাহীদের বিজয় লাভের মূল কারণ এই যে, মুসলিমরা ব্যক্তিগত ও জামাতবদ্ধ জীবনে সর্বদাই পরিচালিত হয়েছে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে। যেভাবে কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা বুঝেছিলেন নেককার সালাফগন তথা প্রথম ইসলামী প্রজন্ম। ইসলাম ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সংগঠন কোনোভাবেই সালাফদের পথ থেকে দূরে সরে যায় না। মুসলিমদের কর্তৃত্বের ১২০০ বছরের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা সালাফদের মানহাজকে যথাযথ প্রমাণ করেছে। কার্যক্ষেত্রে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সালাফদের অনুসারীরাই সফলতা পেয়েছে, বাকিরা আস্বাদন করেছে ব্যর্থতার তিক্ত স্বাদ।

স্বভাবতই প্রত্যেক বৈপ্লবিক সংগঠন নিজ দেশে বিদ্যমান পরিবেশে কাজ করতে গিয়ে ইসলামী মূলনীতি ও সিদ্ধান্তসমূহকে প্রয়োগ করে সৃজনশীলভাবে। কিন্তু নিজেকে বিপ্লবী বা রাজনৈতিকভাবে পরিপক্ক জাহির করতে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন কোনো কারনে ইসলামের মূলনীতিকে অগ্রাহ্য করলে কিংবা সে স্থলে নিজেদের বসানো মূলনীতি বসিয়ে নেবার চেষ্টা করলে, তার মাধ্যমে দুনিয়া-আখিরাতের কোন কল্যাণই হয়না। ইসলামই একমাত্র আন্দোলনের সঠিক ও বাস্তবসম্মত ভিত্তি হতে পারে, দেশে দেশে যার স্বার্থক প্রয়োগ করতে পারে ইসলামপন্থীদের বৈপ্লবিক সংগঠনগুলো।

বৈপ্লবিক সংগঠনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকে আপামর জনসাধারণের সাথে, যারা বিদ্যমান সেক্যুলার ব্যবস্থার নিপীড়নের শিকার। জনগণের হিদায়াতের জন্য, জনগণের মুক্তি আর ইনসাফের জীবনের জন্য আত্মনিবেদিত ইসলামী সংগঠন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে জনগণের মাঝে সুস্থিত প্রভাব বিস্তার করে। হয়ে ওঠে সমাজের সর্বজনমান্য নেতা। জনগণের সাথে বিস্তৃত ও ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকার কল্যাণে এই সংগঠন জনগণের মনোভাব, আশা-আকাঙ্ক্ষা আর চিন্তাভাবনা সম্বন্ধে সর্বদা ওয়াকিবহাল থাকে, তাদের প্রয়োজনে সাড়া দিতে পারে যথাসময়ে। সংগঠন এবং তার কর্মনীতির প্রতি জনগণের সর্বাত্মক সমর্থনই বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের প্রধান উৎস হতে পারে।

বৈপ্লবিক সংগঠন সর্বক্ষণ ও অবিচ্ছেদ্যভাবে জনগণের সাথে সংযুক্ত থাকলে সংগঠনের কাজ হয় কাঙ্খিত মাত্রায় এবং সর্বদাই সাফল্যমন্ডিত। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে, তাদের প্রয়োজনাদি বিবেচনায় না রাখলে সংগঠন জনসমর্থন হারায়। এমন সংগঠনের সংগ্রামী প্রকৃতি আর থাকে না এবং সেই সংগঠন শুকিয়ে অধঃপতিত হয়ে আবদ্ধ, বিচ্ছিন্ন চক্রে পরিণত হয়।

নেতৃত্বের জ্ঞান ও দক্ষতা আয়ত্ব করা এবং সমস্ত প্রকার সংগ্রাম ও কাজে কুশলী হয়ে ওঠা সত্যিকার বৈপ্লবিক সংগঠনের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত ক্ষেত্রেই সংগঠনকে পরস্পরবিরোধী শক্তি ও বলয়গুলোর মধ্যকার সক্ষমতা, বিরোধিতার অনুপাত এবং প্রকৃত পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে হয় সূক্ষ্মতার সাথে, ধীরস্থিরভাবে। সমাজের উত্থান-পতন, মানুষের মেজাজ ও জরুরি প্রয়োজন সংগঠন বুঝতে পারে এবং নির্ধারণ করতে পারে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিতে সংগ্রামের কোন উপায় আর কায়দাটা সবচেয়ে উপযোগী। এমন সংগঠন বিবিধ পরিবেশে, বহু সময়ের অভিজ্ঞতা লাভ করে, বহু দূরূহ সমস্যা আর বাধাবিপত্তি অতিক্রম করার মাধ্যমে হয়ে ওঠে জনগণের

প্রতি নমনীয়। শেখে সতর্ক, দৃঢ় আর সুবিবেচক হয়ে উঠতে। বিশেষত, বিপ্লবের পর যখন দেশের দায়িত্ব নিতে হয়, সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হয়, তখন সমাজে সংগঠনের নেতৃত্বের ভূমিকা আরও বেড়ে যায়।

ইসলামী সংগ্রামের সফলতা নিশ্চিতে সংগঠন তার অগ্রসর অবস্থানকে কাজে লাগায়। ইসলামের দিকে সমাজকে পরিচালনা করার ব্যাপারে পরিস্থিতি অনুসারে, প্রয়োজন অনুযায়ী সুস্পষ্ট নিয়মিত নতুন কাজ তুলে ধরে সংগঠন জনগণের সামনে।

সমাজের সকল গোষ্ঠী, দল ও অংশের কার্যক্রমকে এক করে ইসলামী সংগ্রামকে একই অভিমুখে পরিচালনার মেহনত করা বিপ্লবী সংগঠনের অবশ্যকর্তব্য। এই লক্ষ্য অর্জনে জোরাজুরি নয়, বরং দালিলিক ও যৌক্তিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের মাঝে প্রত্যয় সৃষ্টি করতে হবে। দিতে হবে পরামর্শ ও সুপারিশ। সেসব পরামর্শ ও সুপারিশের তাৎপর্য আর আবশ্যিকতার ব্যাখ্যা তুলে ধরার মাধ্যমে ইসলামপন্থী ও ইসলামআকাঙ্ক্ষী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সংগঠনসমূহকে সম্মিলিতভাবে সঠিক কার্যনীতি অনুসরণে একাত্ম করতে হবে। সংগঠনের জন্য নিজ নেতৃত্বের রীতি ও প্রক্রিয়া সর্বদাই উন্নত করে তোলার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য সংগঠনের আস্থা অর্জন করা জরুরী।

নিজ ত্রুটি-বিচ্যুতি আর ভুলভ্রান্তির অকপট সমালোচনা বৈপ্লবিক সংগঠনের কাজে সাফল্য অর্জনের একটি অপরিহার্য উপাদান। তারা জানে, স্বীকার করে ভুলত্রুটি ছাড়া জীবনযাপন অসম্ভব। সংগঠন তাই ভুল করে ফেললে তার ব্যাখ্যা বা উত্তরণের উপায় খুঁজবে। কিন্তু ভুলকে ঠিক হিসেবে উপস্থাপন করবে না, বা কেউ ধরিয়ে দিলে তা উপেক্ষা করবে না। এমনকি যদি তা বিরোধী শিবির থেকেও হয়। কোনো সংগঠন ভুলত্রুটিকে ধামাচাপা দিতে চাইলে এবং তা ঐভাবে বদ্ধমূল হতে দিলে উক্ত সংগঠন বৈপ্লবিক অবস্থান হতে বিচ্যুত হয়, অধঃপতিত হয়। তার প্রতি আস্থাভাজন থাকা জনগণ তখন মুখ ফিরিয়ে নিতে থাকে।

যখন কোনো সংগঠন সর্বদাই নিজ ভুলত্রুটি নির্ভয়ে, নিঃসংকোচে স্বীকার করেছে এবং আপসহীনভাবে সংশোধন করে, তখনই সাফল্য দেখা দেয়। নিজেদের আত্মসমালোচনা তথা মুহাসাবা এবং তদানুযায়ী ইসলাহ করে নেয়া বিপ্লবী ইসলামপন্থী ব্যক্তি ও সংগঠনের জীবন ও কর্মের এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

এবং সবশেষে যা না বললেই নয়, গোটা পৃথিবীর সকল বিপ্লবী ইসলামপন্থী সংগঠন ও শক্তির প্রতি বৈপ্লবিক সংগঠনের অবশ্যই সংহতি থাকতে হবে। বাংলাদেশসহ সমস্ত দেশের মুসলিমরা বিপ্লবী ইসলামপন্থীদের মস্তিষ্ক, অন্তর থেকে খালি থাকতে পারে না। বৈপ্লবিক সংগঠন নিজ দেশের বাস্তবতা সামনে রেখে কাজ করে, কিন্তু কোনো বিপ্লবী সংগঠনই ভুলতে পারে না যে, আছে অন্যান্য দেশ ও দেশের ইসলামপন্থী বিপ্লবীরা। কুফরের আগ্রাসনের বিপরীতে তাদের লড়াইয়ের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন এবং নিজ দেশে বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পরিচালনার মাঝে কোনো বিরোধ নেই। বরং দ্বীনি ভ্রাতৃত্ববোধের এই চেতনা লালন করা জরুরি। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে দেশে ইসলামী শাসনের প্রত্যাবর্তন এবং খিলাফাহ ফিরে আসার পরিস্থিতি দেখা দেয়ার আগ পর্যন্ত প্রত্যেক ইসলামপন্থী সংগঠনের স্বাতন্ত্র্যের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন তাই কাঙ্খিত। তবে তা যেন প্রতিক্রিয়াশীল, আপসকামীদের ন্যায় সংকীর্ণ সম্প্রদায়িকতায় রূপ না নেয়, তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিপ্লবী সংগঠনের সদস্যদের দীক্ষা দিতে হবে।

কোন বিপ্লবী সংগঠনই জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণতা, নিজ দলের ব্যাপারে আত্মহংকার এবং অন্যান্য ইসলামি সংগঠনের প্রতি তুচ্ছার্থক ও বৈরি মনোভাব বরদাশত করতে পারে না।

নিজ দেশ ও দেশের জনগণের জন্য ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার আশু ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত লক্ষ্যে কাজ করা কাম্য। এবং নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে অন্ধানুসরণ না করে, বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংগ্রাম অব্যাহত রাখা বিপ্লবী সংগঠনের প্রধান কাজ। তবে এটা করতে গিয়ে তারা মুসলিম উম্মাহ ও বিশ্বের বঞ্চিত-নিপীড়িত জনগণকেও ভুলে যায় না, অবজ্ঞা করে না।

সর্বোপরি বিপ্লবী সংগঠন ইসলামপন্থীদের পথনির্দেশ, সহযোগিতা, সংগঠিত ও পরিচালিত করার মাধ্যমে কোনো দেশে আস্থাভাজন ও প্রকৃত নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে পারে আল্লাহ তাআলার সাহায্যে, সহিহ ইলম, ইসলামের আনুগত্য এবং সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যমপন্থী সিদ্ধান্ত ও কর্মনীতি গ্রহণ করার মাধ্যমে।

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

"আপনি বলুন – এটাই আমার পন্থা, আমি এবং আমাকে যারা অনুসরণ করে তারা বাসীরতের সাথে আল্লাহর পথে আহ্বান করি।" – (সূরা ইউসূফ, ১২:১০৮)